...ও কেলেঘাই

-জীবন-জীবিকা ও সাহিত্য

চতুর্থ সংখ্যা ।। মার্চ- ২০২৫

Voll- IV , Issue-I (2025)

চতুর্থ সংখ্যা, মার্চ-২০২৫ Volume-IV, Issue-I(2025)

একটি ওয়েব জার্নাল। কেলেঘাই একটি নদীর নাম। যার বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে রয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপাদান। এই জার্নালের প্রধান দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে-

প্রথমতঃ তীরবর্তী সমাজের জীবন জীবিকায় কেলেঘাই নদী কতখানি অপরিহার্য ছিল এবং আছে তার মৌলিক অন্বেষণ।

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের বিচিত্র শাখা প্রশাখার কল্পলোকে কেলেঘাই নদীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া।

উপদেষ্টা ঃ মনোতোষ আচার্য

সম্পাদক ঃ ড. মৃন্ময় মণ্ডল

'...ও কেলেঘাই'র পক্ষে ড. মৃন্ময় মণ্ডল কর্তৃক

পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৪৫৪ থেকে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ ঃ

মুদ্রণঃ-ফিরহিম এন্টারপ্রাইজ, বেলদা,ফোন- ৯৪৭৫২৫৩৮৯৫

সম্পাদকীয় দপ্তর এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ

'...ও কেলেঘাই' পটাশপুর, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৫৪

ওয়েবসাইট- www.keleghai.in

ই-মেল-o.keleghai@gmail.com

মোবাইল-৯৬৪১৭৮৩৫৩৪

মূল্য ঃ ২১ টাকা

এই সংখ্যায় যাঁরা কলম ধরলেন

অনিতা অগ্নিহোত্রী। সুতনু ঘোষ।
সুকদেব বর্মন। বিষ্ণুপদ দাশ।
মৃন্ময় মণ্ডল। মনোতোষ আচার্য।
গোপাল মাইতি। অক্ষয় কুমার সামন্ত।
বাসুদেব গায়েন। সুপর্ণা।
প্রণব সাহু (বসুতীর্থ)।

অল্পকথায়

কেলেঘাই একটি ছোট্ট নদী- এ নদী আমার নদী, তোমারও নদী। এ 'নদী' জীবনের মতো বহমান, 'নারীর' মতো নীরবে উদ্ভিন্ন। তাই সভ্যতার উদয়লগ্ন হতে নদী মাতৃরূপে পূজিত হন। সভ্যতার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক নিবিড়। এ সম্পর্ক স্নেহের, প্রেমের, অভিসারের, অভিমানের। তাই তো তার সৃষ্টিজাত নির্মাণ, নির্ভরতার আবেশে ঋণী আমরা ও এই পার্থিবজগত। বহু জনপদের আজন্ম ইতিকথা বহমানিত তার অবিরাম ধারা-উপধারায়। জনপদের প্রকীর্ণ কলতানে যেমন নীরব তার অনিন্দ্যকীর্তন, তেমনই আছে বেদনার জগতও। তার গভীর খাতে চিহ্নিত কত পারাপারের ইতিকথা যা বিস্মৃতির অতলতলে ডুকরে মরে। জগতের সমস্ত নদী আজ হারিয়েছে জৌলুস সেই সাথে আমাদের কেলেঘাইও। হারানো সেই দিনের নস্টালজিক পটভূমি, অক্ষর সজ্জায় মেলে ধরতে "...ও কেলেঘাই'র" পথচলা। নিতান্তই সাহিত্যের নিবিড়তায় আবিষ্ট না হয়ে, কেলেঘাই তীরবর্তী জনজাতির নদীমাতৃক অতীত ঐতিহ্য লেখনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক এবারের "...ও কেলেঘাই"র কলেবর। তাই "...ও কেলেঘাই" খুঁজে বেড়ায় অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষকদের, যাদের লেখনীর মাধ্যমে কেলেঘাই হয়ে উঠবে বিশ্বের আঙিনায় এক স্রোতস্বিনী- জীবন্ত নদী। "...ও কেলেঘাই" পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে লেখা সংগ্রহের পরিসর ও ব্যপ্তি ধীরে ধীরে ক্রমাগত সুগম পথে এগিয়ে চলেছে। কিছু পাঠক বর্গের উৎসাহ ও প্রেরনা এবং সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের নানান শাখার ব্যক্তিবর্গের আমার নদী কেলেঘাই সম্পর্কে অন্বেষণ ও অনুসন্ধিৎসা প্রমান করে পত্রিকাটির অস্তিত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে। "...ও কেলেঘাই"র জন্যে চতুর্থ সংখ্যায় যারা কলম ধরেছেন, তাদের প্রতি রইলো ফালগুনী শুভেচ্ছা ও আগাম বাসন্তিক অভিনন্দন। উপদেষ্টা ও পর্যালোচকদের গঠনগত সুচিন্তন মতামত সর্বদা "...ও কেলেঘাই"কে মোহনা প্রাপ্তির দিকে ধাবিত করবে এই আশা রাখি। আনুচ্ছিকভাবে কিছু ত্রুটি থাকলে পাঠকগন তা ক্ষমার চোখে দেখবেন। পাঠকবর্গের গঠনমূলক মতামত আগামী সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসদ যোগাবে।

ড. মৃণ্ময় মণ্ডল
সম্পাদক

মার্চ-২০২৫

একটি নদীকে ভালোবেসে

অনিতা অগ্নিহোত্রী

কাঁসাই, শিলাবতী , দ্বারকেশ্বরের মত ছোটানাগপুর মালভূমি থেকে নয়, ঝাড়গ্রাম থেকে বেরিয়েছে কেলেঘাই নদীটি। বয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে , তারপর কাঁসাই এর সঙ্গে মিশে নাম নিয়েছে হলদি নদী । দু বছর আগে এক ফালগুন মাসে তার সঙ্গে দেখা। নদীর বুক থেকে জল তুলে নিয়ে ভেড়ি বানাবার সমস্যা দেখতে ই যাওয়া। কিন্তু নদীর বিপন্নতার মত সংকটের পাশাপাশি পেলাম পরিবেশ ভাবনা নিয়ে কাজ করার মত নিবেদিত প্রাণ তরুণদের ।এখন কেলেঘাই যে পথে বয়েছে তা মূল গতিপথ নয় ।নদী আগে বইত আমগাছিয়া থেকে রসুল পুর ।জলের ঢাল ছিল সেই পথেই। সে পথ টা এখন মজে গেছে ।বুড়োবুড়ীর দহের কাছে কেলেঘাই আর কাঁসাই যেখানে মিশেছে, সেই জায়গাটি অপরিসর। ফলে জলের গতি রুদ্ধ হয়ে প্রতিবছর বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। আরও দক্ষিণে ঘাটাল শহরে বন্যা আসে বর্ষার শেষ ভাগে। সিংলাইয়ের মোড়ে আড়াআড়ি দেওয়া বাঁধে কেলেঘাইএর পুরোনো ও নতুন খাত আলাদা হয়ে গেছে দেখা যায় ।ড. মৃন্ময় মণ্ডল ও তাঁর সতীর্থ রা কেলেঘাইকে বলেন , আমার নদী। এত টান, মায়া নদীর উপর। এক নদীর জন্য একটি ওয়েবসাইট, তা ছাড়া ওয়েব ও মুদ্রিত ম্যাগাজিন বারহয়, তার বিষয় পরিবেশ, নদী ও সাহিত্য। নাম '...ও কেলেঘাই' ।পাঁচ জনই শিক্ষক। তাঁদের শৈশবের শিক্ষকও আছেন দলে ।একজন গবেষণা করেন। পরিবেশ কর্মী সকলেই। ছোট খাট চাষ বাস আছে। নদীর ভাবনায় জড়িয়ে আছেন সর্বক্ষণ। এঁদের কাছেই শুনলাম, দ্বারকেশ্বর,কংসাবতীর থেকে কেলেঘাই আলাদা, পরিবেশের উপর প্রভাবের দিক থেকে ।কেলেঘাইয়ের জল রক্ষা করে এক অনন্য সামাজিক বাস্তুতন্ত্রকে। এর কূলে বসবাস কারী রাজবংশী জেলেদের জীবন নদীর উপর সতত নির্ভর শীল ।নদীর কূলের আশেপাশে একদা ছিল বহু ওয়েট ল্যান্ড বা জলা জমি। একটিই ফসল হত তাতে । আর বর্ষা কালে পাওয়া যেত নানা রকমের মাছ। জলাজমি গুলিকে কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে আবদ্ধ করে বাণিজ্যিক মাছ চাষ চলেছে বহু বছর হল। এখন যে সব ঝিল বা মিষ্টি জলের ভেড়ি তৈরি হয়েছে তাতে মৎস্যজীবীদের জীবিকা নষ্ট হয়েছে। কারণ সুলভ, সহজলভ্য মাছগুলি হারিয়ে যাচ্ছে নদী অববাহিকা থেকে। এ কেবল ধীবর দের জীবিকার সংকট নয়, গরীবের আহারে পুষ্টিরসংকট ও বটে। জলাভূমি গুলি ভেড়িতে পরিণত হয়েছে বলে রায়ত চাষীরা লীজের টাকা পায়, বিঘে প্রতি পনের কুড়ি হাজার টাকা। সেটা চাষ থেকে আয়ের চেয়ে বেশি। তবে জমি তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এ জমি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কোনদিন পেলেও বছর পনের লাগবে জমির নিজ চরিত্র ফিরিয়ে তাকে চাষযোগ্য করে তুলতে। বাণিজ্যিক চাষ বদলে দিয়েছে পুরোনো চাষের পদ্ধতি। নদীর আড়াআড়ি বাঘালের সংখ্যা বেড়েছে। তাতে মিশেছে প্লাস্টিক, নাইলন নেট,

ফাইবার শীট। ফলে নদীতে আগাছা, কচুরি পানা, ইত্যাদির জন্ম বিঘ্নিত হয়ে ছে।নদী তীরে আগে ছিল হিজলের বন। হিজলের শিকড় মাটি কে রক্ষা করে, জলে তার বেড়া দিলে টেঁকে বছরের পর বছর। কেলেঘাইএর শাখা নদী বাগুই এর তীরে এখনো রয়ে গেছে কিছু হিজলের বন। জঙ্গল বিভাগ স্থানীয় গাছে আগ্রহী নয় মনে হল। কেবল ইউক্যালিপটাস লাগায়। এ গাছ গুলি বাড়ে দ্রুত কিন্তু নীচে জলস্তর নেমে যায়।আগাছা গজায় না নীচে। কেলেঘাই, তার জীব বৈচিত্র ফেরাতে কজন তরুণের কণ্ঠ সরকার পর্যন্ত পৌঁছয় না। অথচ তাদের কাজ নিয়ে আগ্রহী বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপকও।ছোট এক নদী। ১২০ কিলোমিটারের মত তার চলন পথ।কিন্তু মানুষের জীবন, জীবিকা, প্রকৃতির ভারসাম্য রাখায় তার কত যে কাজ। এ নদীর ছোট বড় মাঝারি মাছেদের দিন শেষ হয়ে আসছে। আইড়, পরাল, পাঙ্গাস, চিতল, নয়না, খুড়সি কালবোস,সনা পুঁঠি,ভাতুয়া ,কই, পাঁকাল, ট্যাংরা এরা নি:শেষ হতে বসেছে; কাঁকড়া, জলা ইঁদুর , কচ্ছপ,উদ বিড়ালের মত প্রাণীরা বিলুপ্ত প্রায়। শুষ্ক নদীখাতের পাশে সারি সারি রুই কাতলার ঝিল জাগা গ্রামাঞ্চলে বাতাসে ভেসে বেড়ানো সংকীর্তন কে মনে হয় হাহাকার।একেমন উন্নয়ন? যেখানে প্রকৃতির সম্পদ কে বিনষ্ট করতে চায় মানুষের সৃষ্টিছাড়া , আগ্রাসী লোভ। '...ও কেলেঘাই' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের লগ্নে আমার শুভেচ্ছা রইল। আগামী পৃথিবী কে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক বিবেক কে স্পর্শ করবেই একদিন, এই আশা দুর্মর।

বাগুই নদীর উৎসমুখ ও প্রবাহপথ

(Source and course of the Bagui River)

সুতনু ঘোষ, বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

বাগুই নদী হল কেলেঘাইয়ের একটি উপনদী। অনেক জায়গায় খালের আকার ধারণ করায় একে বাগুই খাল হিসেবে বলা হয়। যদিও এই নদীর কারণেই স্থানে স্থানে বন্যা হতে দেখা যায়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী, বেলদা, দাঁতন, নারায়ণগড়, সবং এবং পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার ওপর দিয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বাগুই নদী এসে মিশেছে কেলেঘাই নদীতে। যদিও বাগুই নদীর প্রবাহপথের অধিকাংশ অংশ দাঁতন ও পটাশপুরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। উৎসমুখের কাছে কেশিয়াড়ী, তারপর বেলদার অল্প অংশ এবং মিলনস্থলের কাছে সবং এর সামান্য অংশ পড়ে। এটি কেলেঘাইয়ের ডান তীরের উপনদী। দাঁতনের কাছাকাছি এই নদীর দুটি ধারা বর্তমান। এই দুটি ধারার আলাদা নাম নেই, তা বাগুই খাল নামেই পরিচিত। বোঝার সুবিধের জন্য বলা যায় - করাট ধারা ও

মনোহরপুর ধারা। অথবা ওপরের ধারা ও নীচের ধারা। যদিও দুটি ধারাই মোটামুটিভাবে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে। এই দুটি ধারা এসে মিশেছে অস্তি গ্রামের কাছে। প্রাচীন কেদারেশ্বর শিব মন্দিরের কাছে এসে। ওপরের ধারা বা করাট ধারার দৈর্ঘ্য বেশি এবং এটিই মুখ্য ধারা বলা যায়।

করাট ধারা - বাগুই নদীর উৎপত্তিস্থল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ীর করাট গ্রাম। দাঁতন ও কেশিয়াড়ী সীমান্তের একটি গ্রাম করাট। গগণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। পাশাপাশি জনবসতি আছে তবে কম। করাট গ্রামের এক মাঠের পাশে বাসুলী মাতার থান আছে। রামশংকর পন্ডা এখানকার পুরোহিত। বাসুলী থানের পেছন দিকে একটি পুকুর। পুকুরের পেছনের দিকে একটি জলাভূমি খালের আকারে কিছুদূর বিস্তৃত হয়েছে। তারপর এটি সংকীর্ণ খালের রূপ নিয়ে বেরিয়েছে। বাসুলী থানের পেছনের এই জলাভূমি হল বাগুই নদীর উৎপত্তিস্থল। উৎসমুখ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে বয়ে চলেছে ধারা। তারপর করাটের পরে প্রবেশ করেছে মুড়াবনি গ্রামে। এরপর চন্দনপুর গ্রামে। ক্ষেতের মাঝে এঁকেবেঁকে এগিয়ে ঢুকেছে চন্দন সরিষা গ্রামে। এরপর কুটকী, কেন্দুয়া, গাজিলা, সয়াপাড়া, খটনগর, হলদিয়া গ্রামের ওপর দিয়ে সরু খালের আকারেই প্রবাহিত হয়েছে। রাণীসরাই এর কাছে হাইরোড ও রেললাইন পেরিয়ে পূর্বদিকে বয়ে চলেছে। এরপর পঞ্চদুর্গা মন্দিরের কিছু দক্ষিণে বয়ে চলেছে পূর্বমুখে। এরপর নহপাড়, কাশিমপুর, নিমা, রামনগর, কেশবচক, আমদা, চাঁদিপুর, বুধ মাঙ্গালি, মুরাদপুর, করঞ্জি, আসদা, আমুরিয়া, পুরুষোত্তমপুর হয়ে অস্তি গ্রামে প্রবেশ। এই অস্তি গ্রামে বাগুই নদীর দুটি উৎসমুখ এসে মিলেছে। এখান থেকে একটি ধারা হয়ে নদী এগিয়ে চলেছে। এরপর বলি মনোহরপুরের ধারাটির আস্তি গ্রাম পর্যন্ত প্রবাহপথের কথা।

মনোহরপুর ধারা - পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের মনোহরপুর। এর কাছেই মোগলমারিতে প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধবিহার আছে। মনোহরপুর গ্রামের মধ্যে রাজবাড়ি, প্রাচীন মন্দির স্থাপত্য প্রভৃতি আছে। এই রাজবাড়ির খুব কাছেই মনোহরপুরের লোকালয়ের কাছ থেকে বেরিয়ে কিছুটা পূর্বদিকে এগিয়েছে নদীটি। তারপর দক্ষিণে বাঁক নিয়ে প্রবেশ করেছে মালিয়ারা সুন্দরপুর গ্রামে। এই গ্রামের উত্তরে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পূর্বদিকে এগিয়ে কাকরাজিত গ্রামের একেবারে উত্তর অংশে এসেছে। এখানে কাকরাজিত গ্রামে ঢোকার রাস্তাটি থাকায় একটি ছোট ব্রিজ তৈরী করা হয়েছে। এই বিষয়ে দুচারকথা বলা প্রয়োজন। সেতুটির নাম মহাপ্রভু সেতু। কাকরাজিতে বিখ্যাত মহাপ্রভু মন্দির থাকায় এই নামকরণ হয়েছে। ২০২০ সালে সেতুটি রূপায়ণে - মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং উদ্বোধনে বিধায়ক বিক্রম চন্দ্র প্রধান। স্কিমের নাম লেখা আছে - কাকরাজীত ও কাজিপাড়া গ্রাম সংসদের মাঝখানে বাবুই খালের ওপর ব্রীজ নির্মাণ। এখানে বাগুই নামের পরিবর্তে বাবুই নামটি ভুল করে ব্যবহার করা হয়েছে। খেয়াল করেছি এর জল গরমকালেও তেমন শুকোয় নি। আষাঢ় মাস (১৪৩১ সাল) প্রবেশ করলেও এই জেলায় এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি।

গ্রীষ্ম তার শেষ মরণ কামড় বসিয়ে চলেছে। অস্বস্তিকর আবহাওয়ার পরিস্থিতি। তবুও বাগুই নদীতে জল শুকোয়নি। এই নদী সাধারণভাবে বর্ষার জলে পুষ্ট। আবার বর্ষার সময় শ্রাবণ মাসে দেখেছি এর কানায় কানায় জল ভরে আছে। মনোহরপুর, মালিয়ারা সুন্দরপুর, কাকরাজিত, কাজিপাড়া ও বৈঁচা গ্রামের উপর দিয়ে নদীর প্রবাহ এসেছে। এরপরে পূর্বমুখী নদী উত্তরমুখী হয়েছে। প্রবেশ করেছে সিরনি গ্রামে। সিরনি সেতুর কাছে নদীটি বেশ চওড়া হয়েছে। তারপর আবার ছোট খালের আকার নিয়েছে। সিরনির পরে কেশরম্ভা গ্রাম। নদীটি কেশরম্ভা ও সিরনি এই দুটি গ্রামের মধ্যে কয়েকবার ঢুকেছে আর বেরিয়েছে। কেশরম্ভা গ্রামের এক জায়গায় নদী অনেক চওড়া হয়েছে। অনেকটা জলাশয়ের মতো। এমনই বয়ে গিয়েছে অনেকটা। তারপর আবার খালের রূপে সাহানিয়া ও আবারও কেশরম্ভা প্রবেশ করে দলবালিয়া গ্রামে এসেছে। এখান থেকে ত্রিকালপুর পর্যন্ত নদী এসেছে উত্তরদিকে। এরপরে নদী গাজুগুটিয়া গ্রামের কাছে বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়েছে। তারপর বেতারুই, বাস্তুপুর, কেদার হয়ে অস্তি গ্রামে প্রবেশ করেছে। অস্তি গ্রামে বাগুই নদীর করাট ধারা ও মনোহরপুর ধারা যুক্ত হয়েছে। বাগুই নদী এগিয়ে চলে - দুটি ধারা মিশে একটি হয়েছে। নদীটি খালের আকারে অস্তি হয়ে আমবিধাননগর প্রবেশ করেছে। এখানে বিখ্যাত কেদারনাথ শিব মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের খুব কাছ দিয়ে বাগুই নদী বয়ে চলেছে। মন্দিরটি দুতিনটি বিশেষ কারণের জন্য প্রসিদ্ধ। দেবতার নাম পাবকেশ্বর বা কেদারেশ্বর শিব। তিনশো বছরের বেশি পুরোনো মাকড়া পাথরের শিখর দেউল। প্রবেশপথের ওপরে কষ্টিপাথরের নবগ্রহ ফলক আছে। মন্দিরের উত্তরে একটি জলাশয় আছে। সেখান থেকে বুদবুদ উঠত। তার ওপরে মাকড়া পাথরের জলহরি নির্মাণ করা হয়েছিল। তাই এটি কেদার ভুড়ভুড়ি নামে পরিচিত ছিল। পাশে বয়ে চলা বাগুই নদী এবং মন্দিরের ভেতরের গম্ভীরার সাথে সম্ভবত জলাশয়টি কোনওভাবে যুক্ত আছে। কেদার ছাড়াও নিকটবর্তী পুরুষোত্তম গ্রামে ঝড়েশ্বর শিবের একটি পুরোনো ছোট আকারের নবরথ বিভাজন যুক্ত দেউল আছে।

কেদার ছাড়িয়ে বাগুই খালটি বেলদা - কাঁথি হাইরোড (SH - ৫) পেরিয়েছে খাকুরদা বাজারের কাছে। এরপর একেবেঁকে খাকুরদা থানা ও দাঁতন ২ বিডিও অফিসের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে। খাকুরদা এলাকার বড়া মহানপুর, ধনেশ্বরপুর, দিঘা, গুর্দালা, গোবিন্দপুর দিয়ে বয়ে চলেছে। নিকটবর্তী শ্যামসুন্দরপুর মহাপ্রভু মন্দির রয়েছে। এরপর প্রবাহপথে গাজুগুরিয়া, কাশিয়া, গহিরা, শশিন্দা, পদিমা, চক গোপাল, রঘুনাথপুর, মির্জাপুর, মধুপুর, বিশ্বনাথপুর, তাপিন্দা, নৈপুর, খড়িগেড়িয়া, কল্লুবার, পুশা প্রভৃতি গ্রামগুলি পড়বে। এরপর আয়মা বারবারিয়া, কুঁজাবেড়িয়া, গোকুলপুর গ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাগুই নদী কপতিপুর গ্রামে কেলেঘাইয়ের সাথে মিশেছে। সবং ব্লকের দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কপতিপুর। এই মিলনস্থল কেলেঘাইয়ের বিখ্যাত তুলসী চারার মেলার কাছেই।

এখানে যে গ্রামগুলির কথা উৎসমুখ থেকে মিলনস্থল পর্যন্ত পরপর বর্ণনা করলাম সেগুলির ভৌগোলিক সীমা স্পর্শ করেছে এ নদী। অর্থাৎ এইসব গ্রামের ওপর দিয়ে গিয়েছে অথবা

গ্রামের সীমা স্পর্শ করেছে। কোনও গ্রামের সীমানার কাছে হয়ত নদী ঢুকেছে এবং মাত্র কয়েকশো মিটার বয়ে গিয়েছে এবং অন্য গ্রামে প্রবেশ করেছে। এই গ্রামগুলিও ধরা হয়েছে। তবে এই নদীর প্রভাব হোক, বন্যার প্রভাব হোক অথবা এর সাথে জড়িত মানুষ ও পশুপাখি গাছপালা প্রভৃতির পরিসর অনেক বড়। বাগুই নদী অববাহিকার গ্রাম সংখ্যা এই বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশি। অন্যান্য নদীর তুলনায় এর দৈর্ঘ্য (প্রায় ৪০ কিমি) অনেক কম হলেও এটি দুই মেদিনীপুরের বেশ কিছু জনপদকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে যতদিন যাচ্ছে, এর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

বাংলার পার্বণ পৌষ মেলা

সুকদেব বর্মন, গোপালপুর, পটাশপুর

"সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ন ধরা
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গ ভরা"

পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং থানা ও পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার মাঝখানে সীমানা বরাবর কেলেঘাই নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে।কোলন্দা গ্রাম (সবং থানার অন্তর্গত) ও গোকুল পুর গ্রাম (পটাশপুর থানার অন্তর্গত) এই দুটি গ্রামে মাঝামাঝি নদীর তটে বাংলায় পৌষ মাসে পৌষ সংক্রান্তি দিনে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম (প্রায় ৫২৮ বছর) গোকুলানন্দ জীউ ব্রত-পালন করা হয়। অষ্টাদশ শতকে গোকুলানন্দ গোস্বামী পৌষ সংক্রান্তিতে রাত ১২টা নাগাদ নদীর মাঝখানে, তাঁর যোগমঞ্চে সাধনা করতে করতে তিনি সেইখানে মারা যান। তাঁর আগে গোকুলানন্দ গোস্বামী তাঁর শিষ্য বিপ্র প্রসাদকে ডেকে বলে যান পৌষ সংক্রান্তিতে তুলসী মঞ্চে তিনমুঠো মাটি দিলে সবার মনোস্কামনা পূরণ হবে। পরে বছর থেকে শিষ্য বিপ্র প্রসাদ পৌষ সংক্রান্তির ভোর রাতে মকর স্নান করে কেলেঘাই নদী থেকে তিন মুঠো মাটি নিয়ে গুরুর সমাধিস্থ তুলসী মঞ্চে দিয়ে আসতেন। তারপর এপারে এসে সবাই মিলে কীর্তন ও ভোজন করতেন। ভক্তরা বিশ্বাস করেন গোকুলানন্দ জীউ কৃপায় রোগ ব্যাধি (চর্ম ও গোদ রোগ) সেরে যায়। তাই বাচ্চা থেকে বুড়ো, পুরুষ থেকে মহিলা সকলে স্নান করেন কেলেঘাইয়ের জলে।প্রবল শীত উপেক্ষা করে বহু মানুষ মেতে ওঠেন মন্দিরের মাথায় মাটি দেওয়ার আনন্দে।

অতীতে সমাধিস্থ তুলসী মঞ্চে মাটি দেওয়া উদ্দেশ্যে মেলা বসে (তুলসী চারা মেলা)। আমার বাড়ি পটাশপুর থানার, গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত আমি ছোটবেলা দাদুর (প্রফুল্ল কুমার বর্মন) কাঁধে চেপে ভোর রাতে পাথরঘাটা হয়ে সিংলাই মোড়ে থেকে দাদু-নাতি নৌকা চেপে মাটি কাটতে চলে যেতাম। সেখানে গিয়ে মকর স্নান করে গোকুলানন্দ জীউ চরনে মাটি দেওয়া। দাদুর হাত ধরে সারা মেলা ঘুরে বেড়ানো, সঙ্গে হাতে তৈরি রঙিন

কাজের চরখা ,মাটির তৈরি খোল, অমর্ষির শঙ্খ ও শাখা দোকান ,মিষ্টি (কদমা) যা মেলায় সব ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করতো। বাড়ি ফিরার সময় আমার এক হাতে চরখা ও কদমা খেতে খেতে বাড়ি আসতাম ।

তখন যাতায়াত মাধ্যম ছিল নৌকো ও বাঁশেরসাঁকো (বেহুলা খেয়া)। ২০১১ সালে নদী সংস্কারের ফলে মেলা আয়তন বেড়ে যায় ও মেলা সাত- আট দিন হয়। মেলা যাওয়া মূল আকর্ষণ ছিল ভটভটি (সার্ভিস) চেপে যাওয়া যা মূলত সিংলাই মোড় ও মাধবচক থেকে ছাড়া হতো। ২০২৫ সালে এসে নদীর বর্তমান অবস্থা-নদীর গতিপথ পরিবর্তন ,অতিরিক্ত পরিমাণে (ঘাটি/ বাঘাল) , নদীর উভয়ে ধারে বাঁধা ঘেঁষে কৃত্রিম ভাবে ভেড়ি তৈরি, নদীর বক্ষে ইঁট ভাটা গড়ে উঠে। এর ফলে ছোটো খাতে পরিনত হতে চলেছে। সেইখানে দেখা নেই কোন নৌকা বা ভটভটি এইগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ও বাসকারী মনুষ্যগোষ্ঠী কাছে বিগত ।বর্তমানে কেবল একটি মাধ্যম যাতায়াত (বেহুলা খেয়া)বাঁশের সাঁকো কংক্রিটের রাস্তা দ্বারা যুক্ত করা। যার দ্বারা পৌষ সংক্রান্তিতে গোকুলানন্দ জীউ ব্রত-পালন করতে যেতে পারা যায়। কুয়াশা মাখা ভোরে নদীর জলের ঠান্ডা বাতাসে দাদুর থেকে নাতির গল্প শুনে সারা শরীর শিহরিত হয়ে যেতো । যন্ত্রচালিত সভ্যতার কাছে ভবিষ্যত প্রজন্ম আজ ইতিহাস,স্মৃতিচারণের কাছে আজ বিকলাঙ্গ।

ও কেলেঘাই

বিষ্ণুপদ দাশ, নৈপুর, পটাশপুর

হিজলের ঘেরা জলে মাছেদের খুনসুটি
বাবলা অর্জুন আশশ্যাওড়ায়
খেলা করুক বুলবুলি, চড়াই।
শালিখের কিচির মিচির, শামুকখোলের মেলা
পরিযায়ী সুখের সন্ধানে-
পালকুল আর বঁইচিকুলের গন্ধ গায়ে
আমাদের ঘিরে থাক তাল তমালেরা
বরকন্দাজি সৈনিকের মতো।

কেলেঘাই কুলে কুলে- শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পুরী যাত্রা

মৃন্ময় মণ্ডল,গোপালপুর, পটাশপুর

এসো প্রেমের ঠাকুর অশান্ত এ-ভবে
বিভেদ বিদ্বেষ তবে দূরীভূত হবে

অঝর নয়নে বৃষ্টির দিনে কিম্বা চৈত্রের দাবদাহে, কেলেঘাই নদীর আকাশে বাতাসে সর্বত্রই সারা বছর জুড়ে কোন না কোন গঞ্জ-গ্রামে কৃষ্ণনাম উদ্ভাসিত হয়ে আসছে প্রাচীন কাল হতে। কেলেঘাই বাসীদের এই প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমের ইতিহাসের বীজ সয়ং রোপণ করেছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব নিজেই। কোন প্রেক্ষাপটে, কিসের ভিত্তিতে এক আদিম নদীনির্ভর জনজাতি কৃষ্ণপ্রেমে মজলেন ও বৈষ্ণব ধর্মকে জীবনের সাথে একাত্ম করে ফেললেন তার রহস্য লুকিয়ে আছে কেলেঘাই নদী পথে চৈতন্য মহাপ্রভুর পুরী যাত্রার সঙ্গে। আজ থেকে পাঁচশত বছর পূর্বের ইতিহাস। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ শে মাঘ ভোর রাতে নিমাই পন্ডিত গৃহত্যাগ করেন। সেই দিন অর্থাৎ ২৭ শে মাঘ শ্রীখণ্ডে তিনি প্রস্তুত হন সন্ন্যাসী দীক্ষার। ঐদিন পূর্বাহ্নে অর্থাৎ ২৮ শে মাঘ তার মস্তক মন্ডন ও দন্ডধারণ হয়। এরপর শচীমাতার নির্দেশ অনুসারে নীলাচল অর্থাৎ পুরীর দিকে রওনা হওয়ার দরবার শুরু হয়। শ্রীচৈতন্য নাম ধারণ করে তাঁর ইচ্ছা ছিল বৃন্দাবন গমন করার। কিন্তু শচীমাতার আদেশ ও সেই সময় দিল্লির সম্রাট সেকেন্দর শাহরের হিন্দু বিদ্বেষী আগ্রাসন তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষের জন্মভিটা ওড্র দেশে (অধুনা উড়িষ্যা) যেতে উৎসাহিত করেছিল। কেননা ঐ ওড্র দেশ ছিল গৌড়ের সুলতান ও দিল্লির বাদশাহের অধিকারের বাইরে এক স্বাধীন প্রদেশ। একাদশ শতকে পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ হয়েছিল রাজা অনন্ত বর্মনের পৃষ্ঠপোষকতায়। বিশেষত রথ যাত্রার আগে এই জগন্নাথ ধাম দর্শন পূর্ব ভারতের ধর্মপিপাসু মানুষের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যদেব সেই আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই ফালগুন (কারো মতে ১২ ই ফালগুন) কালীঘাট থেকে যাত্রা শুরু করেন নীলাচলের উদ্দেশে।

সেই সময় তিনটি মূল পথ ছিল বঙ্গদেশ থেকে পুরী যাওয়ার। চৈতন্যদেব ও তার পার্ষদগন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করে সিদ্ধান্ত নিলেন 'দ্বারির জাঙ্গাল' অর্থে নদী বা খালের ধারে ধারে রাস্তা অনুস্মরণ করে নীলাচল পৌঁছবেন। কথিত আছে দ্বারি নামক কোন এক ধনী বিধবা গোস্বামী বঙ্গদেশ থেকে পুরী যাওয়ার জন্য নদীর ধারে ধারে এই পথ নির্মাণ করেছিলেন। এই পথের অধিকাংশই স্থান ছিল খাল-বিল ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। যাইহোক ১৫ই ফালগুন কালীঘাট থেকে ১৬ তারিখে পৌঁছে যান আটিসারা অধুনা বারইপুর। তারপর দিন অর্থাৎ ১৭ ই ফালগুন ছত্রভোগ অধুনা জয়নগর-মজিলপুর হয়ে নৌকা পথে গঙ্গা পেরিয়ে ১৮ তারিখে তাম্রলিপ্ত অধুনা তমলুকে পৌঁছান। পরের দিন হাঁটা পথে তমলুক থেকে কাপাসবেড়িয়া- দক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণপুর -বাসুদেবপুর হয়ে নরঘাট-এ

পৌঁছান। সেখানেই দানী কর্তৃক নদী অধুনা হলদি নদী ধরে পশ্চিম দিকে নৌকা পথে নীলাচল যাত্রা শুরু করেন ১৯ শে ফালগুন। কথিত আছে তিনি পরের দিন ২০ তারিখ কাপাসদা নারায়ণগঞ্জ এবং ২২ তারিখে জলেশ্বরে পৌঁছান। নরঘাট থেকে নারায়ণগড়ের কাপাসদা চৈতন্যদেব পৌঁছেছিলেন মাত্র ১ দিনে যা পায়ে হাঁটা পথে কোনদিনই সম্ভব ছিল না। কেবলমাত্র হলদি নদীর পশ্চিম শাখা যা কেলেঘাই নদী নামে অধুনা পরিচিত সেই নৌপথই ছিল এই পথ অতিক্রম করার একমাত্র উপায়। আঞ্চলিক লোককথায় কথিত আছে চৈতন্যদেব নৌকা পথে নরঘাট থেকে যাত্রা শুরু করার পর কেলেঘাই নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী বুলাকিপুর মৌজায় 'পাণ্ডব ঘাট' অধুনা পাথরঘাটায় (পটাশপুর থানার) প্রাচীন শিবমন্দিরে বৈকালিক বিশ্রাম গ্রহণ করেন ও নিজে হস্তে শিবের পূজা করেন। যদিও বা এই বিষয়ে কোনো প্রামাণ্য নথি বা তথ্য পাওয়া যায়নি। এই পাথরঘাটা বা পান্ডব ঘাটের কিছুটা পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বাঘুই নদীর মিলনস্থল পেরিয়ে কিছু দূরে কেলেঘাই নদী অবস্থিত একটি উঁচু টিপি থেকে জগন্নাথ মন্দিরের চুড়াটি মহাপ্রভু দেখতে পান। অনুমান করা হয় সেই পুন্য স্থানটি হল তুলসীচারা যা গোকুলপুর মৌজার মধ্যে পড়ে। তবে এখান থেকে পুরীর গজন্নাথ মন্দির অনেক দূর, তাই অনেকেই মনে করেন কটক এর কাছে তুলসী চওড়া জায়গাটি সেই স্থান। যা ভারগবি নদীর তীরে অবস্থিত। বিখ্যাত পরিব্রাজক হান্টার এর মতে কেলেঘাই ও ভারগবি নদী অভিন্ন। সেই মোতাবেক অনুমান করা যায় কেলেঘাই নদীর উৎস তদানীন্তনকালে আরও পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। সে যাই হোক এর পরে মহাপ্রভু কিছুটা স্থল পথে নারায়ণগড় গিয়েছিলেন। তখন নারায়ণগড় স্থানীয় এক রাজার রাজধানী ছিল। সেই রাজধানীর প্রধান নগরের প্রবেশ পথে একটি বিশাল লৌহদ্বার ছিল। পুরী যেতে গেলে এই দ্বার পার হতে হত। একে যমদুয়ার বা ব্রাহ্মণীদুয়ার বলা হত। এর চার পাশে ছিল ঘন জঙ্গল ও হিংস্র পশুদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। সেই রাজ্যের শাসক গোপীনাথ পট্টনায়েকের সহায়তায় মহাপ্রভু তারপর বেলদা ময়নাপাড়া হয়ে দাঁতন পৌঁছলেন। দাঁতন থেকে নদী পথে জলেশ্বর এবং জলেশ্বর থেকে রেমুনা অধুনা বালেশ্বর-ভদ্রক হয়ে তিনি সম্ভবত দোল পূর্ণিমার কিছুদিন আগে পুরী পৌঁছে গিয়েছিলেন।

একই ভাবে ১৫১৪ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে চৈতন্যদেব গৌড়ে ফিরেছিলেন এই একই পথে। তিনি হাঁটা পথে দাঁতন থেকে নারায়ণগড় পৌঁছান। নারায়ণগড় থেকে নৌকায় কেলেঘাই নদীপথে পিছলদায় (চন্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর) এলেন সঙ্গে ছিলেন রামানন্দ। রামানন্দ আর সঙ্গ দিলেন না, এখানে মন্তেশ্বর নদীতে মহাপ্রভুকে তুলে দিলেন নৌকায় সঙ্গে পাঠালেন এক তুর্কি ডিহিদারকে। কারণ এই জলপথ ছিল জলদস্যুদের দ্বারা অত্যাচারিত। এই সময়ে তিনি এই পথ ধরেই গৌড়ে এসেছেন এবং গৌড় থেকে নীলাচলে ফিরে গিয়েছেন। সুতরাং চৈতন্যদেব বেশকয়েকবার নীলাচল যাত্রায় কেলেঘাই নদীকে ব্যবহার করেছেন সুপরিকল্পিত ভাবে। অনুমান করা যেতে পারে কেলেঘাইর কুলে কুলে তিনি তাঁর প্রেমের অস্ত্র, মন্ত্র নদী নির্ভর জনজাতির মননে গেঁথে দিয়েছিলেন। সেই কেলঘাই নদীর ধারা ক্ষীণ হয়ে এলেও এখনো তাঁর স্রোত, প্রবাহ বহমান। একই ভাবে এই একুশ শতকে চৈতন্য

প্রেমের বিশুদ্ধতার ছটা ফিকে হয়ে এলেও তার মুধুরতা একে বারে ফিকে হয়ে যায়নি এই কেলেঘাই নদীর জনজাতির জন জীবনে। তাইত শীতের রাতে, গ্রীষ্মের দুপুরে কিম্বা নবান্নের অগ্রহায়নে কৃষ্ণনাম উদ্ভাসিত হয় কেলেঘাই নদীর আকাশে বাতাসে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, মহাপ্রভুর কথায় প্রেম-ই হয়ে উঠুক প্রধান অস্ত্র এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার।

তথ্যসুত্র- •শ্রীচৈতন্যের পুরীযাত্রাপথ-ড. তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
•সবং আঞ্চলিক ইতিবৃত্ত- গৌতম পাত্র ও শান্তনু অধিকারী
•শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য- মালীবুড়ো

অবগাহন মন্ত্র

মনোতোষ আচার্য, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর

বুনো ঘাসের গন্ধ ফেরালো কবিতার থানে
অচেনা পাখির ডাক চেনালো
কবিতার ডিহি

যে পথ চলেছে এঁকেবেঁকে আশ্চর্য কোমর দুলিয়ে
বাঁশঝাড়, লালপেড়ে দিঘির আয়নায় মুখ দেখে
অনন্তের সাঁঝবাতির খোঁজে

হেমন্তের রোদ্দুরে ঝিকিয়ে ওঠা গহনাবড়ির আলো
ডেকে নেয় মরাইয়ের আশ্চর্য ফোঁকরে

হারানো কৈশোরবেলা ফড়িঙের পাখনার মতো
কেঁপে কেঁপে ওঠে কেলেঘাই চরে

ঘাস,পাতাদের সহজিয়া যাপন উৎসব
এখানে সবুজ বন দূরে দূরে মূলবাসী গ্রাম
নদীটি নর্তকী বটে
জলে তার মন্ত্র জেগে আছে
অবগাহনের...

মৃত্যুহীন তটিনী

গোপাল মাইতি, সেলামবাদ, পটাশপুর

বিন্দু বিন্দু জলের স্রোতে
বইছে জলের ধারা
নদী রূপে প্লাবনতা
সামনে এগিয়ে যাওয়া।
কত যন্ত্রনা ভেজা চোখ নিয়ে
কত মাটিকে ভিজিয়ে
কত পাহাড় পর্বত নুড়ি ক্ষুইয়ে
খরস্রোতা রূপ নিয়ে
কত বাধাবিপত্তি এড়িয়ে
আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে ক্ষতচিহ্ন সহে
সাগরের পানে ছোটা।
আমি এক স্রোতস্বিনী
আমি এক নদী।
আমি এক গ্রামীণ...
...কেলেঘাই নদী
রূপ রস স্বাদ গন্ধে
ছুঁয়ে যায় বুক
জলের স্বচ্ছতায় চোখের কোমলতায়
হাসিতে ভরে থাকে মুখ।
কত গ্রামকে বুকে নিয়ে
শত শত মানুষের অঙ্গ ছুঁয়ে
হাসি কান্না জীবন জীবিকা বাঁচিয়ে
আমারও স্বপ্ন দেখা।
মৃত্যুহীন চোখে জেগে থাকা
আমি তটিনী ....
গ্রামীন নদী মানুষের রূপে আঁকা।

ও কেলেঘাই

অক্ষয় কুমার সামন্ত, সেলমাবাদ, পটাশপুর

কেমন আছো?
চৈত্রের রৌদ্রে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছো
অথচ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলে তোমার ঢেউয়ের শ্বাস প্রশ্বাসে
দুই তীরে যত গ্রাম আছে
রাতের গভীরেও
তাদের চোখের ঘুম কেড়ে নাও।
ঘরবাড়ি ফসলের ক্ষেত সবকিছু ডুবিয়ে
মানুষকে চোখের জলে ভাসিয়ে
কি এমন সুখ পাও?

সন্ধ্যা নামার সময়ে
আমি বসেছিলাম কেলেঘাই নদীর বুকের কাছে।
সে তার শুকনো চোখের পাতা
তুলে আমার দিকে তাকালো তারপর বললো: আমি তো চাই স্রোত হয়ে বয়ে যেতে
নীরবে।
কিন্তু মানুষই তো আমার পথ আটকায়।
আমার শরীরের যেখানে সেখানে
ইঁট ভাটি করে ক্ষতবিক্ষত করে
সে বেদনা দেখাবো কোথায়!
আমার সেই দুঃখের ভার
ঢেউ হয়ে তো ভাসাবেই!

খরস্রোতা দুপুর

বাসুদেব গায়েন, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর

কতদিন হলো আমাদের কথা হয়নি।
সেই কবে পেরিয়েছিলাম
নাম না জানা খরস্রোতা দুপুর
তিল তিসি ছোলা ও ভুট্টার বিস্তার দিকে দিকে

প্রেমের সংক্ষিপ্ত শটগুলো এখন
তোমার চোখে জ্বালা ধরায় হয়তোবা
জল বালতি কিংবা বথুয়া শাকের পালি হাতে তুমি
এগিয়ে যাচ্ছো সিঁড়ির ধাপ

অপুর্ব ও তো এখন আর কথা বলে না
লোহা, পাইপ এসবের সংসারে
অতি রঞ্জিত শৈলী বদলে হাতটাই তো ভেঙে বসলো

পেয়ারা ডালের অবাঞ্ছিত অর্কিড
শুষে নিচ্ছে তোমার জীবন রস,
তোমার প্রেমের খোঁজে
তাচ্ছিল্য করেছি ক্রনিক ব্যাধিকেও

কতদিন হলো তোমার সাথে কথা হয় না
কেলেঘাই পাড়ে গোধূলির ম্লান
আলো মুছে গেলে
নিশাচর চোখ
দেখে নিচ্ছে প্রদীপ হাতে তোমাকে।

নদীটি আমার মা

সুপর্ণা, দেহাটি, পশ্চিম মেদিনীপুর

উৎসব শেষে ফিরে যায় সবাই,
নদীটির বুকে জমে ক্ষত।
আধুনিক সভ্যতার মায়াহীন থাবা,
খুবলে তোলে তার হৃদয়ের পলি;
তবুও তো সে নদী, সে নারী, সে জননী
আলো নিভে গেলে বাড়ে আবর্জনার স্তূপ।
ক্ষমাহীন দুর্গন্ধ তবুও প্রাণ সঞ্চারে,
ক্লেদহীন বয়ে চলে আমার কেলেঘাই।

কাইলাঘাই'য়ের মনে'র কথা

প্রণব সাহু (বাসুতীর্থ), বেলকি, পশ্চিম মেদিনীপুর

মোকে কি তোমানে চিনো-
কিছুটা চিনলেও সব কথা নিশ্চয় জানো নি
আমিতো তুমানকার মতো মেদিনীপুর বাসি,
মানে - মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র
অখন্ড মেদনীপুর।
ডাকনাম কাইলা
পুরো নাম -কাইলাঘাই
ভালো নাম -কেলেঘাই।
তুমানকার মতো মোর নামের
একটা মানে আছে
'কাইলা' শব্দটি আসসে কেলান্দি'নু
আর 'ঘাই' শব্দটি'র মানে 'জলযাবার প্রধান মু'
কাইলাঘাই নামের মানে-
কেলান্দি'র জলযাবার প্রধান মু।
তবে মোর একটা জীবনের ইতিহাস আছে -
শুনো তবে
ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল এর কেলান্দি টিপিতে
আমার জন্ম
জন্মের পর কুনো রকম কইরা বাইচা গেছি
কেননা জন্মের পর মোর খাওয়ার অভাব ছিল
আমিতো জল ছাড়া বাঁচতে পারিনি
তুমানে যেমন দুধ খাও
মোর দরকার জল।
সাঁকরাইল নু কেশিয়াড়ি আমি রোগা ভোগা
অল্পস্বল্প জল খাইয়া বাঁইচা আছি
তবে হ্যাঁ আমি নারানগড়ে আইসা
বাচ্চা বেলা ছাইড়া যুবক হইলি
আমার একটু গতর বাড়ল
এদিক ওদিক অনেকগুলা নালা, খাল, স্রোত-
ভালোবাইসা মোর সঙ্গে থাকতে চাইল
মোর'ও ভালো লাগলো।
পটাশপুরে আমি পরিণত হইলি
লোকের উপকার করতে লাগলি
আমার মাটি লিয়া তুলসী চারা মাটির পাহাড়
তৈরি হইল
আমাকে পূজা করতে লাগলো।
মোর কি আনন্দ লাগে -
সকল লোক যখন মোর মাটি মাখে-
জল খায়।
পটাশপুর ছাইড়া যখন ভগবানপুর,
সবং দিয়া যাই তখন আমি বুড়া
মানে- বার্ধক্যে আইসা গেছি
কুনো রকম কইরা
আস্তে আস্তে মোহাড় পর্যন্ত গেছি
গিয়া দেখি আমার বন্ধু ঢেউ ভাঙ্গার কাছে
মোর জন্য অপেক্ষা করছে
বন্ধুর নাম কাঁসাই
আমিও কাঁসাইয়ের সাথে দেখা করি
দিয়া দুই বন্ধু মিইলা মোনে হলদি নাম নিলি।
মোর বয়স কত তুমানে জানো...
প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার বছর।
আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে-
এগরা, পটাশপুর, ভগবানপুর,
ময়নার চারপাশে যখন সমুদ্র ছিল
তারপর মোর জন্ম।
তবে মোর জন্মের হিসাব
মোর মা রাইখা যায়নি
পাড়া-প্রতিবেশীরা অনুমান কইরা বলে

তাই আমি বল্লি।
জন্মের কথা ছাড়ো-
'জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো'
কাজের কথায় আইসি
আমি যেভাবে লোকের উপকার করি
ক'জন করে বলো।
সাঁকরাইলনু মহাড় পর্যন্ত
কাউকে না কাউকে সাহায্য করি
এই জন্য তো মোকে ছাইড়া কেউ যায়নি
এত ভালোবাসি
যে মোর কোল ছাইড়া তানে যাইতে চাইনি
কেনো না -
জল দেই মাছ দেই দেই ভূমি আর মাটি
তাতেই করে চাষবাস আর গড়ে বসত বাটি।
মোর উপর দিইয়া যাতায়াত করে
ডিঙ্গি নৌকা চালায়
কত লোক মাছ ধরে, মাটি লেয়।
মাঝে মাঝে মোর খুব কষ্ট হয়
যখন মোর ছাতির উপর কোদাল চালায়,
চালায়, গর্ত করে-
আর মোর বুকটাকে ঝাঁঝরা করে।
তুমানে বলো
এই বুড়া বয়সে এতো অত্যাচার সহ্য করা যায়?
কিনা মাছ চাষ করবে, ইটভাটা গড়বে।
আগে করার লোক গুলা ভাল ছিল-
তানে বুইঝা শুইনা কাজ করতো
কত রকমের মাছ খাইতে দিতি
মোর উপর দিয়ে ডিঙ্গি নৌকায় যাতাত হতো
মেলা বসতো -
পানিফল-কাশ ফুল হতো।
আর এখন ইটভাটা, মাছ চাষ ...
এখনকার লোকগুলার উল্কাপাত ধরছে
মোর হাত-পা সব কাইটা দিয়া
মাছের ভেড়ি-ইটভাটা করতে লাগছে
মোর বুকের উপর ঘর বানাইতে শুরু করছে
যত নোংরা পচা প্লাস্টিক মোর গায়ে ফ্যালে
মোর রূপটাকে পাল্টে দিছে
আগে আমি কত সুন্দর ছিলি
কত লোক দেখতে আসত
আমি শুদ্ধ ও পবিত্র ছিলি
এখনতো দূষিত নোংরা খাল।
আমিও হাল ছাড়িনি
দেখি তোদের কত ক্ষমতা
আমিও রাইগা বেশ কিছু লোকের ঘরবাড়ি,
মাছের ভেড়ি ভাইঙ্গা দিছি
দেখ কেমন লাগে।
তবে আমি সাবধান করে দিলি
যদি মোর কথা না শুনু-
মোকে নাই মাইনা চলু
এবছর যেটা করলি
আবার তোনকার সবকিছু নষ্ট কইরা দিব...
মনে থাকে যেন!

-জীবন জীবিকায় আমার নদী কেলেঘাই-

নদীমাতৃক জীবন জীবিকার আমূল পরিবর্তন উন্নয়নশীল দেশ গুলিতে একটি সাধারণ বিষয়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় পেশাগত পরিবর্তন বিপুলভাবে গ্রাস করেছে নদী কেন্দ্রিক হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী হাজার পেশাগত শিল্পকে। জনজাতির প্রকৃতি নির্ভর জীবন-যাপন আজ বিপন্ন যা নৃতাত্ত্বিক আর্কাইভে স্থান করে নিয়েছে। কেলেঘাই নদী তীরবর্তী জেলেদের নদী থেকে মাছ ধরার আদিম কৌশল 'বাসা ঘেরা' এমনই এক শিল্প। আগামী প্রজন্ম ডিজিটাল প্লাটফর্মে এদের অস্তিত্ব ছোঁয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু এই শিল্পের খুঁটিনাটি চিরতরে এই পৃথিবী থেকে মহাশূন্যের দিকে হারিয়ে যাবে।